ভাসিলি মিত্রোখিন। কেজিবির এই কর্মকর্তা অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল নথিপত্র নকল করে তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখতেন। এতে ঠাঁই পেয়েছে ষাট, সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু ঘটনাপ্রবাহ। সম্প্রতি প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভ অবলম্বনে লিখেছেন মিজানুর রহমান খান

সিআইএর 'চিঠি', মওদুদের বিস্ময়

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ অবাক হলেন। বললেন, এটাও বানোয়াট। সিআইএর কাছ থেকে আমি কোনো চিঠি পাইনি। মিত্রোখিন আর্কাইভে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ঢাকায় কথিত কেজিবি-তৎপরতার কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে, ঢাকার কেজিবি মিশন সিআইএ কর্মকর্তার বরাতে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদের কাছে একটি সাজানো চিঠি পাঠায়। এতে সিআইএর পক্ষে মওদুদ আহমদকে জিয়ার সরকার উৎখাতে দক্ষিণপন্থি গোষ্ঠীর তৎপরতায় মার্কিন সমর্থনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় *(কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, পেঙ্গুইন গ্রুপ, পৃষ্ঠা ৩৫৪)*। 'আপনি এমন কোনো চিঠি প্রাপ্তির কথা কি স্মরণ করতে পারেন'—এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে মওদুদ আহমেদ স্মিত হেসে বলেন, 'না। এমন কোনো চিঠি আমি পাইনি। চিঠি যেমন সাজানো, তেমনি আমাকে যে লেখা হয়েছে, তাও সাজানো।'

মিত্রোখিন লিখেছেন, কেজিবির 'ডিসইনফরমেশন ও কভার্ট অ্যাকশন সেল' সার্ভিস-এ প্রণীত ওই চিঠিতে সিআইএর পক্ষে মওদুদ আহমদকে জিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থি বিরোধিতায় মার্কিন সমর্থন নিশ্চিত করা হয়।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এন্ড্রু ও স্বপক্ষত্যাগী কেজিবির সাবেক আর্কাইভিস্ট ভাসিলি মিত্রোখিন লিখেছেন, 'জেনারেল জিয়াউর রহমান কিংবা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ক্রেমলিনের (সোভিয়েত সরকারের সচিবালয়) অনুগ্রহভাজন ছিলেন না। মস্কোর মতে, এরা উভয়ই ঘনিষ্ঠ ছিলেন ওয়াশিংটনের। জিয়াউর রহমানের প্রাথমিক পদক্ষেপের অন্যতম হচ্ছে সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র কথাটি তুলে দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার কথাটি প্রতিস্থাপিত করা। তার অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তি ছিল বেসরকারি খাত এবং বিরাষ্ট্রীকরণ। এ ছাড়া বাংলাদেশের জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। জিয়া বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মুসলিম বিশ্ব ও চীনের ঘনিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এটা নিশ্চিত করা সম্ভব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, 'জিয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে উৎসাহী ছিলেন। আর সে কারণে তিনি মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট হন। তার কথায়, তবে এটাও ঠিক যে ইন্দিরা গান্ধী যদি সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত না হতেন, তাহলে তার পক্ষে এই সম্পর্কের বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভবত বেশ কঠিন হতো। মোরারজি দেশাই আসার ফলে দিল্লি ও মস্কো উভয়ের সঙ্গেই জিয়া প্রশাসনের বন্ধুত্ব বাড়ে।' ১৯৭৫ সালের নভেম্বর থেকে '৭৮-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব পালনরত তোবারক হোসেন এ প্রতিবেদকের কাছে মঙ্গলবার স্বীকার করেন যে, জিয়া তাকে বিশেষ দূত হিসেবে পাঠালেও ওই সময় মস্কোর নীতির পরিবর্তন ঘটেনি। মস্কো সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ এবং গম কেনার অর্থ পরিশোধেও চাপ দেয়। তবে তার সফরের পর উত্তেজনা প্রশমিত হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে সোভিয়েতের তরফে খাদ্য, পণ্য কিংবা প্রকল্প—কোনো খাতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো সাহায্য দেয়নি। মিগের খুচরা যন্ত্রাংশ নিয়ে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত একটি সোভিয়েত জাহাজকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। *(সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, তারেক শামসুর রেহমান, একাডেমিক পাবিলিশার্স, পৃষ্ঠা-১০৫)*

পঁচাত্তরের পরে ১৯৯১ সালে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমানের সফরই ছিল কোনো বাংলাদেশী রাজনীতিকের প্রথম মস্কো সফর।

মিত্রোখিন আর্কাইভ মতে, 'জিয়া-প্রশাসনের বিরুদ্ধে মস্কো প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করে। ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত মুখপত্র ইজভেস্তিয়া অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশে দক্ষিণপন্থি ও মাওবাদী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে উসকানি ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেজিবি ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে বাংলাদেশে পিস কোরের কার্যক্রমবিরোধী তৎপরতা চালায়। ওয়াশিংটনের সঙ্গে পিস কোর বিষয়ক চুক্তি (২৯ জুলাই, '৭৮) সম্পাদনের পরে কেজিবির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক সরকারবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।'

ওই সময়ে পিস কোর কার্যক্রমকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সন্দেহের চোখেই দেখেছে। সাধারণভাবে পিস কোরের আড়ালে সিআইএ র সক্রিয় তৎপরতার অভিযোগ ছিল। ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী সম্পাদিত সাপ্তাহিক মেইনস্ট্রিম পত্রিকার মতে, ভারতে গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগে পিস কোর নিষিদ্ধ করা হয়। তোবারক হোসেন উল্লেখ করেন, আমি এ চুক্তির পক্ষেই ছিলাম। ওই সময়ে ৫৪টি দেশে কেনেডি প্রবর্তিত পিস কোর কর্মসূচি ছিল। তবে এটা ঠিক যে, দক্ষিণ আমেরিকায় পিস কোর কার্যক্রমে সিআইএর জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল। জিয়া-মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য মশিউর রহমান যাদু মিয়াও এ-সংক্রান্ত মার্কিন

প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার পক্ষেই অবস্থান নেন।

সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, জিয়াউর রহমান সখ্য বজায় রাখতে ক্রেমলিনের দিকেও ঝুঁকতে চেয়েছেন। আর তিনি তাতে ইতিবাচক সাড়াও পেয়েছেন। আর সে কারণেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শে সিপিবি জিয়ার খাল কাটা কর্মসূচি এবং 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোটের পক্ষে সিপিবিকে অবস্থান নিতে হয়। তার কথায়, এটা ছিল আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু পার্টির শৃঙ্খলা তো আমরা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিপিবির ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো এ বক্তব্য সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে, পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ এর বিরুদ্ধে ছিল। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান বলেন, মণি সিং প্রমুখ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তারা এবং তাদের অনুসারীরা অবশ্য আগাগোড়াই যেকোনো দক্ষিণপন্থি লাইন অনুসরণের বিপক্ষে ছিলেন। জিয়ার গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিপিবির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আমিও ওই ভুল সিদ্ধান্তের অন্যতম সমর্থক ছিলাম। এ জন্য আমি আজ অনুতপ্ত।

১৯৭৫ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে মুদ্রিত সিপিবির একটি 'গোপনীয়' পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "৭ নভেম্বর 'সিপাহী বিদ্রোহের' মধ্য দিয়ে দক্ষিণপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো আরো সামনে অগ্রসর হয়েছে। তবে আমাদের বিবেচনায় বর্তমান সরকার চরিত্রগতভাবে দক্ষিণপন্থি প্রতিক্রিয়াশীল হলেও মোশতাক-সরকারের সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে এর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, বর্তমান সরকার মোশতাক-সরকারের মতো প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতৃবর্গের খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, এই সরকার নিজেকে নির্দলীয় অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ দাবি করছে। তৃতীয়ত, এই সরকার সামরিক বাহিনীর সিপাহিদের ব্যাপক অংশের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। এই সরকারও মোশতাক-সরকারের ধারা অনুসরণে দেশের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল নীতিগুলো ক্রমে বাতিলের পক্ষে যাচ্ছে। এবং দেশকে পুনরায় পুঁজিবাদের পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তারা মোশতাক-সরকারকেই অনুসরণ করছে। ভারত-সোভিয়েতবিরোধী, বিশেষত ভারতবিরোধী প্রচারণা তীব্র করে তোলার সুযোগ করে দিয়েছে।' *(রাজনৈতিক প্রস্তাব, পৃষ্ঠা ১১-১২, ১৯৭৬)*

মিত্রোখিন আর্কাইভ বলেছে, কেজিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে 'অ্যাকটিভ মেজার্স' (কেজিবির পরিভাষা। গোপনে মিডিয়ার অপব্যবহার থেকে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের লক্ষ্যে পরিচালিত সক্রিয় ব্যবস্থা) সংখ্যা ১৯৭৮ সালের ৯০টি থেকে ১৯৭৯ সালে প্রায় ২০০-তে উন্নীত হয়। এই ২০০ 'সক্রিয় ব্যবস্থার' কোনো বিবরণ প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভে নেই। জিয়ার আমলে বাংলাদেশে কেজিবির ২০ জন প্রভাবশালী এজেন্ট সক্রিয় ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কারো পরিচয় বা কার্যক্রমও অপ্রকাশিত থেকে গেছে। তবে কেজিবির দাবি, "১৯৭৯ সালে তাদের পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ১০১টি নিবন্ধ প্রকাশ এ বং 'ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য' (ডিজইনফরমেশন) প্রচারে ৪৪টি সমাবেশ সংগঠিত করে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে কেজিবির 'ডিসইনফরমেশন ও কভার্ট অ্যাকশন সেল' সার্ভিস-এ প্রণীত ২৬টি বিভিন্ন ধরনের প্রতারণাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করা হয়।"

মিত্রোখিনের মতে, এই মিথ্যাচারের মূল ভিত্তি ছিল জিয়াউর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে সিআইএর তথাকথিত ষড়যন্ত্রের কল্পকাহিনী প্রচার *(মিত্রোখিন আর্কাইভ, পৃষ্ঠা ৩৫৪)*। 'আমি পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে জিয়াকে কখনো কেজিবির কোনো তৎপরতা সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না'—মন্তব্য করেছেন তোবারক হোসেন। জিয়া প্রশাসনের একটি সূত্রের দাবি, জিয়া কখনো সোভিয়েত সম্পর্কে বিদ্বষপ্রসূত মন্তব্য করেননি। মণি সিংকে আটকের ঘটনায় জিয়া রুশ রাষ্ট্রদূতকে তার সেনাবাহিনীর বাসায় আমন্ত্রণ জানান। তাকে একান্তে বলেন, সেনাবাহিনীসংক্রান্ত তার কিছু বক্তব্যের জন্য তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে আনা হয়েছে মাত্র। সোভিয়েত নেতারা যাতে তাকে ভুল না বোঝেন। ওই সূত্র মতে, জিয়ার এই উদ্যোগের ফলে ক্রেমলিন এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি।

কেজিবির সাংগঠনিক কাঠামোতে *(মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা ৪৯৯)* দেখা যায়, কেজিবি চেয়ারম্যান ও তার ডেপুটিরা এবং 'কেজিবি পাটি কমিটি' ছিল সোভিয়েত পলিটব্যুরোর অঙ্গ। কেজিবি চেয়ারম্যানের অধীনে থাকা চিফ ডাইরেক্টরেটসের পাঁচটি বিভাগ ছিল। এর প্রথম বিভাগটিই হচ্ছে ফার্স্ট (ফরেন ইন্টেলিজেন্স)। সংক্ষেপে এফসিডি অর্থাৎ ফার্স্ট চিফ (ফরেন ইন্টেলিজেন্স) ডাইরেক্টরেটস। এই বিভাগের অন্যতম অঙ্গ 'সার্ভিস-এ'। এর মূল কাজ ছিল 'ডিসইনফরমেশন, কভার্ট অ্যাকশন'। সিপিবির কয়েকজন প্রবীণ নেতা দাবি করেছেন, তাদের সঙ্গে কেজিবির আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ছিল না।

অপারেশন আরসেনাল

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আনা হয় 'অপারেশন আরসেনাল' বা 'অভিযান অস্ত্রভাণ্ডার'। এর মূল কথা ছিল, জিয়াউর রহমানের বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপগুলোর সঙ্গে ইয়ং নামের জনৈক সিআইএর কর্মকর্তা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত *(মিত্রোখিন আর্কাইভ, পৃষ্ঠা ৩৫৪)*। লক্ষণীয়, মিত্রোখিন অবশ্য ইয়ং নামের সিআইএ কর্মকর্তার উপস্থিতি ভিত্তিহীন বলে সমর্থন বা প্রত্যাখান করা থেকে সতর্কতার সঙ্গে বিরত থাকেন।

এন্ড্রু লিখেছেন, 'সত্তরের দশকের শেষাশেষি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অ্যাকটিভ মেজার্স প্রচারণার মাধ্যমে যতটুকু সাফল্যই অর্জিত হোক না কেন, তার সুফল ভেস্তে গেছে ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে সোভিয়েতের আগ্রাসন ও পরবর্তী নিষ্ঠুর যুদ্ধে। কারণ উভয় দেশই ওই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।' এখানে উল্লেখ্য, সিপিবি প্রকাশ্য জনসভা করে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ও আফগান বিপ্লবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল।

* তৃতীয় কিস্তি 'মোশতাক ও তোয়াবকে নিয়ে কেজিবির কৌশল'